৭ বিশেষ প্রবন্ধ
দলিত
জীবন ও সংগ্রাম

দলিত সাহিত্যচর্চার ইতিহাস : প্রান্তজনের শিকড় সন্ধান

রিয়া মুখার্জি *

'হিন্দুত্ববাদ' মূলত দাঁড়িয়ে আছে তিনটি ব্যবস্থার ওপর — প্রথমত, বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথা, দ্বিতীয়ত পুরোহিততন্ত্র, এবং তৃতীয় খুঁটিটি হল ধর্ম বা ঈশ্বরমুখীনতা। এইভাবেই ধর্ম ও রাষ্ট্রের যুগলবন্দি নিম্নতম শ্রেণি শূদ্রদের প্রথমে মানসিক ও পরে সাংস্কৃতিক দাসত্বে বন্দি করে। ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন এদেশে প্রবেশকারী আর্যদের সঙ্গে ভারতের মূলনিবাসী প্রাগার্য গোষ্ঠীর সংঘর্ষ ও আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমেই বর্ণাশ্রম প্রথার জন্ম হয়েছিল। আর্য-অনার্য এই সংঘর্ষে কৌশলী আর্যরা জয়লাভ করে নিজেদের বিধিবিধান জোরপূর্বক অনার্যদের ওপর চাপিয়ে বর্ণাশ্রম প্রথাকে স্থায়ী রূপ দান করে, যা বিগত সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে শূদ্র ও দলিত শোষণের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে দেখা দেয়। পৌরাণিক হিন্দুত্ববাদীরা এই মূল নিবাসী অনার্যদের সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য জুড়ে 'রাক্ষস', 'অসুর', দৈত্য', 'দাস' থেকে শুরু করে ভল্লুক, বানর, কিরাত, নিষাদ প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করেছে। আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ-এর দশম মণ্ডলের 'পুরুষসুক্ত' নামক একটি সুক্ততে বলা হয়েছে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পা থেকে শূদ্রদের উৎপত্তি হয়েছে। ঋগ্বেদে জাতিভেদের উল্লেখ (৩/৫৩/১৪, দশম মণ্ডলের ৯০তম সুক্তের বিভিন্ন ঋক) থাকলেও 'চণ্ডাল' কথাটির উল্লেখ নেই। বেদোত্তরকালে পুরুষমেধায় নরবলির উল্লেখ করতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'চণ্ডাল' জাতির মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৪টি নরবলির মধ্যে ১৬৫তম বলিটিই ছিল চণ্ডাল। ভজসেনীয় সংহিতাগ্রন্থের শেষ অংশ থেকে

জানা যায় তৎকালে বায়ুদেবতাকে সন্তুষ্ট রাখতে এইরূপ নরবলির আয়োজন করা হত।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের অপর একটি শক্ত খুঁটি হল মনুসংহিতা নামক স্মৃতিশাস্ত্র। মনু (আসল নাম সুমতি ভার্গব) রাজা পুষ্যমিত্র শুঙ্গের আমলে (১৭০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ-১৫০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) এই স্মৃতি শাস্ত্রটি রচনা করেন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ছিলেন বর্ণে ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথের সেনাপতি, কৌশলে রাজাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছিলেন। রাজা হয়ে ইনি প্রথমে ঘোষণা করেছিলেন বৌদ্ধ হত্যাকারীদের তিনি ১০০ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন। তাঁর আমলে রচিত মনুসংহিতাতে মনু শূদ্রদের সম্পর্কে যেসব বিধান দিয়েছিলেন আলোচ্য প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে তার কয়েকটি উল্লেখ করি, অন্ত্যজ ব্যক্তি যদি কোন অঙ্গের দ্বারা উচ্চবর্ণকে আঘাত করে তাহলে সেই অঙ্গ ছেদন করা হবে। শূদ্র যদি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে তার কোমরে ও নিতম্বে লোহা পুড়িয়ে দাগ দিয়ে তাকে দেশ থেকে নির্বাসন দিতে হবে। মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ের মধ্যে ৭টি অধ্যায়ের ১৪টি শ্লোকে এইভাবেই চণ্ডাল অর্থটি ঘুরে ফিরে সেছে। বর্ণভেদ-এর অপর এক চিরায়ত রূপ বাল্মিকীর রামায়ণ-এ প্রত্যক্ষ হয়। ভগবান রামচন্দ্র শূদ্র হয়ে শম্বুকের তপস্যা করার শাস্তি হিসেবে নিজ হাতে তার মুণ্ড ছেদ করেন। এই গ্রন্থের অপর একটি কাহিনীতে দেখি, অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা ত্রিশঙ্কু কুলগুরু বশিষ্ঠের পুত্রদের অভিশাপে চণ্ডালে পরিণত হওয়ার পর এক বিভৎস চেহারার অধিকারী হয়ে মৃতদেহের সৎকার করতেন, তার খাদ্য ছিল কুকুরের মাংস। রামায়ণ-এ কথিত ত্রিশঙ্কুর চণ্ডাল হওয়ার কাহিনী। বেদব্যাস রচিত মহাভারতের ত্রয়োদশ পর্বে পুর্নকথিত হয়েছে। জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা দেবব্রতকে অসম্মান করার জন্য পিতার অভিশাপে বিশ্বামিত্রর পঞ্চাশজন পুত্র চণ্ডালে পরিণত হয়। ফা হিয়েন-এর ভারত বিবরণীতে চণ্ডালদের কথা আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-এ নগর পরিকল্পনার প্রান্তিক সীমানায় এদের বাসস্থান এবং তাদের কাজ নগরের নিরাপত্তা রক্ষা করা। 'অপস্তম্ব' বৌধায়ন, গৌতম, বশিষ্ঠ অনেকের ঘুরেফিরে চণ্ডালদের কথা এসেছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না এই চণ্ডালরা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে থাকা অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী। ১৮৮৯ থেকে ১৯১১ এই তিরিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলার চণ্ডালরা সরকারি নথিপত্রে চণ্ডাল পরিচিতি থেকে মুক্তি লাভ করেছিল।

শোষণপটু হিন্দুধর্মের এই ব্রাহ্মণ্যবাদ সর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিবাদী স্বর-এর জন্ম হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে মানবতাবাদের ধ্বনি ঘোষিত হয়েছিল গৌতম বুদ্ধের বাণীতে। গৌতম বুদ্ধের আগেই ভারতে বস্তুবাদী, সংস্কৃতির একটি সুব্যবস্থিত রূপ চার্বাক দর্শন এই ব্রাহ্মণ্য শোষণতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুবাদের অপর এক ধারক ছিল আজীবক সম্প্রদায়। বৌদ্ধ চুরাশি সিদ্ধর মধ্যে অনেক কবি আত্মপরিচয় অংশে নিজেকে 'চণ্ডাল' বলেছেন। জৈন দর্শন ও জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করে ত্যাগ, অহিংসা ও প্রেমের বাণী প্রচার করেছে। বাংলার অন্ত্যজ জেলে-মালো-মুচি-মেথর-পোদ-শূদ্র-

ধোপা-নাপিত-কামার-কুমোর মিলে ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে কৈবর্ত বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে অত্যাচারী রাজশক্তিকে পরাজিত করে প্রায় ছয় বছর তাদের শাসন জারি রেখেছিল। কৈবর্ত নেতা দিব্যোক-এর আমলে সংঘটিত হওয়া এই বিপ্লব অবশেষে ১০৮২ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়। পালরাজা রামপাল সামন্তরাজাদের সহযোগিতায় কৈবর্ত নেতা ভীমকে পরাজিত করে বরেন্দ্র ভূমি পুনরায় দখল করেন। পালরাজারা এই বিদ্রোহ দমনে চরম নৃশংশতার পরিচয় স্বরূপ কৈবর্ত নেতা ভীমের পরিবারকে ভীমের সামনে হত্যা করে তাকে নারকীয় মৃত্যুদণ্ড দেয়। পরবর্তী কালে কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন শাসকের আমলে অনেকখানি সুফী প্রভাবেই বাংলার সাধারণ জনসমাজ-এর একাংশ যারা একসময় ছিল বজ্রযানী বৌদ্ধ, তারা অধিকাংশই ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত হয়, যেখানে জাতপাতের অনুশাসন অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে জাতপাতের নিপীড়ন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গে কিছুটা কম ছিল। এরই পাশাপাশি লালন, হাসান রাজা সিরাজ সাই, হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রমুখ সমন্বয়কামী ও মানবতাবাদের প্রচারকদের প্রভাব ও অস্বীকার করা যায় না। দ্বাদশ শতকের দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন মহীশূরের বাসিন্দা বাসব। ব্রাহ্মণসন্তান হওয়া সত্ত্বেও বাসব উদ্ভাবিত লিঙ্গায়েত মত সনাতনী হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। উত্তর কর্ণাটক ছিল এই আন্দোলনে সূতিকাগার। মধ্যযুগে ভারতে ভক্তিবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জননায়ক সন্তদের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে সব থেকে জনপ্রিয় ও সুপরিচিত ছিলেন কবীর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর-এর পরিবার প্রথম থেকেই ছিলেন কবীরপন্থী। দলিত সমাজের বরেণ্য নেতা হিসেবে বাবাসাহেব উঠে আসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন জাতপাতের বিষে জর্জরিত পশ্চিম ভারতেরই একজন মানুষ মহারাষ্ট্রের অধিবাসী জ্যোতিরাও ফুলে, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'গোলামগিরি' এই বইটি ছিল দলিত মানুষের পক্ষ থেকে তাদের আন্দোলনের ম্যানিফেস্টো। দক্ষিণ ভারতের অপর এক বর্ণবিরোধী যোদ্ধার নাম পেরিয়ার রামাসামী (১৮৭৯-১৯৭৩)।

ব্রিটিশদের আগমন ও ভারতবর্ষে শাসক হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠা, সঙ্গে নিয়ে আসা নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরি দক্ষতা আর প্রগতিশীল উৎপাদনরীতি এই দেশে শিল্পবিপ্লব ঘটায়। সব থেকে সুদূরপ্রসারী বিষয় হল একটি নতুন প্রগতিশীল আইন ব্যবস্থার প্রণয়ন যা দীর্ঘ দিনের প্রচলিত জাতবৈষম্যপূর্ণ ধর্মীয় বিধিনিষেধ প্রভাবিত সমাজ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। মনুবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের করায়ত্ত থেকে শিক্ষাব্যবস্থা সার্বজনীন আলোকে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ রাজশক্তি তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই এই দেশের মূল নিবাসী শূদ্র তথা নিম্নবর্ণের মানুষকে শিক্ষার অঙ্গনে টেনে এনেছিল। কিন্তু এর ফলে নতুন অভ্যুত্থান সূচিত হয়েছিল। দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য সমাজ ও প্রার্থনা সমাজের বিপ্রতীপে ১৮৭৩

খ্রিস্টাব্দে জ্যোতিরাও ফুলে 'সত্যশোধক সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমাজের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য প্রতিরোধ করে বর্ণভেদ প্রথার অবসান ও নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। জ্যোতিরাও ফুলের ভাবশিষ্য হিসেবেই যেন মহারাষ্ট্রের দলিত আন্দোলনের একজন নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হলেন ড.বি.আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬ খিস্টাব্দ)। তাঁর অপরিসীম উদ্যোম-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অনন্য সাধারণ মেধা। তিনি জন্মেছিলেন মহারাষ্ট্রের মূলানির মাহার গোষ্ঠীতে। মুচি ও মেথর বৃত্তি করেন এই শ্রেণির মানুষ। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্মক্ষেত্রে একটানা বঞ্চনার শিকার হতে হতে একসময় তিনি দলিতমুক্তি আন্দোলনের প্রতি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে ওঠেন। মূকনায়ক (১৯২০), বহিষ্কৃত (১৯২৭) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তাঁর ধারালো লেখনী বঞ্চিত মানুষকে তাদের কণ্ঠস্বর ফিরিয়ে দেয়। এই সময়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত রণধ্বনিটি তুলেছিলেন 'এডুকেট, অ্যাজিটেট, ওরগানাইজ'। প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে এই প্রবাদপ্রতিম মানুষটির আজীবন মরণপণ সংগ্রামের খুব অল্প অংশই হয়তো তুলে ধরতে পারলাম। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলে তিনি আইনমন্ত্রীর পদ পান এবং তার উপর অর্পিত হয় স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার দায়িত্ব। ড. আম্বেদকর বুঝতে পেরেছিলেন একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি নির্ভর আন্দোলনই পারবে দলিতদের মুখপত্র হতে। এই সময় থেকেই তিনি অন্ত্যজ মানুষের লড়াইয়ের স্বার্থে শিক্ষা নামক হাতিয়ারটিকে ওতোপ্রোতভাবে মিশিয়ে দিয়ে 'পিপলস্ এডুকেশন স্যোসাইটি'-র মাধ্যমে বোম্বেতে সিদ্ধার্থ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫০ সলে সিদ্ধার্থ কলেজের স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা 'সিদ্ধার্থ সাহিত্য সঙ্ঘ' নামে একটি সাহিত্য সংগঠন তৈরি করেন। এই সাহিত্য সংগঠন থেকেই পরবর্তীকালে 'মহারাষ্ট্র দলিত সাহিত্য সংঘ-র জন্ম হয়। ১৯৪৬ সালের ১৪ অক্টোবর ড. আম্বেদকর তাঁর অসংখ্য অনুগামীদের নিয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। গান্ধীজীর 'হরিজন' মার্কসের প্রলেতারিয়েত (সর্বহারা) এই দুই আশ্রয়ধর্মী ও বিধ্বংসী সংজ্ঞার বাইরে তাঁরা তাঁদের জন্য এক নতুন সংজ্ঞার প্রয়োজন বোধ করে ১৯৫৮ সালে প্রথম সম্মেলন, পরবর্তীকালে ১৯৬৭ সালে 'মহারাষ্ট্র বৌদ্ধ সাহিত্য পরিষদ'-এর একটি সম্মেলনে বক্তা এম.এন. ওয়াংখাড়ে প্রথম বলেন যে রামায়ণ, মহাভারত-এ দলিত সাহিত্য নেই, দলিতদের আলাদা সাহিত্য তৈরি করতে হবে। মার্কিন দেশের কলোদের মত। ১৯৬৯ সলে 'মারাঠওয়াড়া' পত্রিকার দীপাবলী সংখ্যায় দলিত সাহিত্যের সংজ্ঞা, ইতিহাস আর পরিচয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয় যে তারপর থেকেই 'দলিত সাহিত্য' শব্দটি মারাঠা সাহিত্যের আলোচনার এক বিশেষ ধরনের সাহিত্য প্রকরণের জন্ম দেয়। ১৯৭২ সালের ১৯ জুলাই মহারাষ্ট্রের ব্যতিক্রমী ও শক্তিশালী দলিত কবি নামদেও ধসাল-এর বাস্তুবাড়ির টালির চালার নীচে অর্জুন ভাঙলে, জে.ডি. দয়া পাওয়ার, উমাকান্ত রণধীর প্রমুখ সাহিত্যিকরা মিলিত আড্ডায় ব্ল্যাক প্যান্থারদের ধাঁচে 'দলিত প্যান্থার' নামক সাংস্কৃতিক মঞ্চের জন্ম দেন। এই সময়

থেকেই দলিত সাহিত্য আন্দোলনে মহারাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের অন্যান্য ভাষাভাষী অঞ্চলে। কন্নড় প্রদেশের প্রায় প্রত্যেকটি জেলায় সমাজবদলের লক্ষ্য সামনে রেখে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে গড়ে উঠেছিল 'বাণ্ডইয়া আন্দোলন'। ১৯৮৮ সালে মারাঠি ভাষায় লক্ষণ মানে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লিখে সাহিত্য অ্যাকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার পর ১৯৯০ সালে কন্নড় সাহিত্যিক দেবানুর মহাদেব তাঁর *কুসুমাবালে* উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অ্যাকাদেমি পুরস্কার লাভ করলে সাহিত্যের এই বর্গটি আন্তর্জাতিক পরিসরে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। মারাঠি লেখক নামদেও ধসাল-এর কাব্যগ্রন্থ গোলপিঠা (১৯৭২) বোম্বের অস্পৃশ্য মানুষদের মুখের ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেয় প্রথমবার। বাবুরাও বাগুলের লেখা ছোট গল্প সংকলন জিভা মি জাত চোরালি হোতি (যখন আমি জাত লুকিয়ে ছিলাম) মারাঠি দলিত সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে অনেকের মতে কৃষ্ণকায়দের জ্যাজ সঙ্গীতের সমতুল্য। গুজরাতে দলিত সাহিত্যের প্রধান কবি ছিলেন নীরব প্যাটেল। ১৯৭৬ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠান বিরোধী কাব্যগ্রন্থ আক্রোশ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। মঙ্গল রাঠোর, যশোবন্থ বসোলা, জয়ন্ত পারমার, রাজু সোলাঙ্কি প্রমুখ কবিরা গুজরাতি ভাষায় দলিত সাহিত্যের ধারাকে পুষ্ট করেন। মধ্যযুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ভক্তি আন্দোলন বিশেষ করে সুফি কবি শেখ ফরিদ, কবীর, গুরু নানক ও অন্যান্য শিখ গুরুদের পাশাপাশি ভগৎ সিং-এর আন্দেলন পাঞ্জাবি সাহিত্যকে বিপুলভাবে আন্দোলিত করেছিল। গোর্কির আত্মচরিত গরহাজির আদমি (১৯৯৪) প্রকাশিত হয়েই সমাদৃত হয়। পাঞ্জাবি ভাষার উপন্যাসের চিরাচরিত ধারা বদলে গুরু দয়াল সিংহ-র মারহি দাদিওয়া উপন্যাসটি ৬০-এর দশকের শেষের দিকে প্রকাশিত হয় সোহম সিং শীতলের উপন্যাস যুগ বদল গিয়া, কিংবা লাল সিং দিল-এর কবিতাগুলো দলিত জীবনের যন্ত্রণাগুলোকে শিকড় শুদ্ধ তুলে ধরেছে। আশির দশকের শেষে কোডঙ্গি, কালাম, মানুষাঙ্গাদা, দলিত কালাক্কু প্রভৃতি তামিল পত্রিকা দলিত সমাজ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। চো-দার্মান-এর জীবন শুরু হয়েছিল শিশু শ্রমিক হিসেবে, তাঁর লেখা ছোটো গল্প নাসুক্কাম (পিষে মারা) ছোটগল্পের জন্য 'কথা' পারস্কার পায়। উনহাই রাজনের ছোটোগল্পের নাম এ্যাঙ্গার। পেশায় স্কুল শিক্ষক ইয়ায়াম তাঁর কোভেরু কালুদাইহাল (খচ্চর) উপন্যাসে দেখিয়েছেন ক্রিশ্চান দলিতরা দলিতদের মধ্যে দলিততম। পূর্ব গোদাবরী জেলার দলিত কবি কিয়েভিমান্না তেলেগু সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অসাধারণ অবদানের জন্য সাহিত্য অ্যাকাদেমি পুরস্কার পান। পুরস্কৃত গল্পটির নাম গুডিসেলিকালি পোত্থুন্মেয়ী। ১৯৭৮ সালে মণ্ডল কমিশনের বিরুদ্ধে সারা দেশে যখন উত্তাল আবহাওয়া তৈরি হয়েছে সেই একই সময়ে ড. আম্বেদকর-এর জন্মশতবার্ষিকী সারা ভারতবর্ষে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয় এবং আম্বেদকর রচনাবলী তামিল ভাষায় ব্যাপক হারে অনূদিত হয়। মার্কিন দেশের কালো লেখকরা আত্মকথার ধরনকে একসময় প্রধান হাতিয়ার হিসেবে অবলম্বন করেছিল

আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে। অনেক তরুণ দলিত লেখক তাদের সাহিত্য জীবন আত্মজীবনী রচনার মধ্য দিয়ে শুরু করেছেন। তাঁরা একে বলছেন 'খর্বতার সাহিত্য' বা বনসাইসেশন। ব্যাপকভাবে এটি ঘটেছে ১৯৭৮ সালে দয়া পাওয়ারের আত্মকথা বালুতা প্রকাশের পর থেকে। বালুতা ছাড়াও পি.ই. সোনকাম্বলের আটয়া নিন্‌চেপকাশি ও লক্ষণ মানের উপমা শিল্পসাফল্যই হয়তো আত্মকথনের এই ধারাটিকে দলিতদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। উত্তরপ্রদেশের ওম প্রকাশ বাল্মিকীর আত্মকথনটির নাম জুথন। 'জুথন' শব্দের অর্থ উচ্ছিষ্ট। ১৯৯২ সালে অর্জুন ডাঙলের সম্পাদনায় ওরিয়েন্ট লঙম্যানের থেকে বেরোয় পয়জনড ব্রেড—দলিত কবিতা, গল্প, আত্মজীবনী, আলোচনার সংকলন। ১৯৯৭-এ সাহিত্য অ্যাকাদেমি থেকে দেবেশ রায়ের সম্পাদনায় এর একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয় দলিত নামে, ডাঙলের লেখাই এই অনুবাদ গ্রন্থটির মূল ভরকেন্দ্র। এছাড়া ১৯২৭ সালের চাভাদর সত্যাগ্রহ মঞ্চে আম্বেদকর-এর ভাষণ আলোচ্য বইতে অনূদিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে মারাঠী লেখক দয়া পাওয়ারের আত্মজীবনী বালুতা, শঙ্করাও খরাটের আত্মজীবনী তরল অন্তরাল, শরণকুমার নিম্বালের আত্মজীবনী অক্করমসি অনূদিত হয়েছে। 'অক্করমসির'র অর্থ জারজ। পরবর্তীকালে দ্য আউটকাসস্ট (২০০৭) নামে অক্সফোর্ড প্রকাশনা থেকে এটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেছেন সন্তোষ ভুমকর। এছাড়াও মারাঠী লেখক দাদাসাহেব মোরের আত্মজীবনী গবাল, কন্নড় দলিত সাহিত্যিক অরবিন্দ মালাগাত্তির গভর্ণমেন্ট ব্রাহ্মণ, অংশবিশেষ অনূদিত হয়েছে। অনুবাদের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি ওয়াই.বি. সত্যনারায়ণের মাই ফাদার বালাইয়া। বাঙালি দলিত লেখকদের আত্মজীবনীর ধারায় পাই পৌণ্ড্র সমাজের মানুষ রাইচরণ সর্দারের দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা, ব্রজেন্দ্রনাথ সরকারের জীবনকথা, মনোরঞ্জন ব্যাপারির ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন (২০১২), পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষ শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ প্রণিত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ, হরিদাস পালিতের লেখা একজন পতিত জাতের বলি, প্রমরঞ্জন ঠাকুরের লেখা আত্মচরিত বা পূর্বস্মৃতি, ড. অনিল রঞ্জন বিশ্বাসের রঙ বেরঙের দিনগুলি, বিভূতিভূষণ বিশ্বাসের গেঁয়ো ভূতের আত্মকথা, সুনীল কৃষ্ণ মণ্ডলের আমার জীবন আমার সংগ্রাম, ড. মনোরঞ্জন সরকারের একজন দলিতের আত্মকথা, রাজু দাসের একজন রিক্সাওয়ালার আত্মকথা, বনমালী গোস্বামীর অবর-বেলায় পাড়ি, গোপাল হীরার ছিন্নমূল জীবনের ইতিহাসের রূপরেখা ও প্রাসঙ্গিক অনুভূতি। আলোচ্য আত্মজীবনীগুলি দলিত সাহিত্যের ধারাকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করে চলেছে।

১৯৪৭ সালের পার্টিশান জন্ম দিয়েছে 'দেশভাগের সাহিত্য' বর্গের। অসম্ভব জরুরী এই সাহিত্য ভুবনের একটি বড় অংশ জুড়ে বিরাজ করছে উদ্বাস্তু দলিতদের সৃষ্ট গল্প, উপন্যাস, আত্মজীবনী। এই ধারার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকৃতি লেখক যতীন বালার ছোটগল্প সংকলন দলিত মানুষের গল্প, শ্যামল কুমার প্রমাণিক-এর শম্বুক ও অন্যান্য গল্প, দলিত গল্প দলিত লেখক, মনোরঞ্জন ব্যাপারীর লেখা ছন্নছাড়া, বাতাসে বারুদের গন্ধ, ছেঁড়া

ছেঁড়া জীবন, এছাড়া চতুর্থ দুনিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে শতবর্ষের বাঙলা দলিত সাহিত্য লেখাগুলি জুড়ে আছে উদ্বাস্তু দলিত মানুষদের বুক নিংড়ানো হাহাকার। গাঙচিল প্রকাশনা সংস্থা থেকে বেরিয়েছে মনন কুমার মন্ডলের সম্পাদনায় পার্টিশান সাহিত্য-দেশ-কাল স্মৃতি, মনন কুমার মন্ডলের অপর বইটির নাম বাংলার পার্টিশান কথা-উত্তর প্রজন্মের খোঁজ। আশিস হীরার সম্পাদনা করেছেন দেশভাগে নিম্নবর্ণ নামক বইটির। ড. চিত্ত মন্ডল ও ড. প্রথমা রায়মন্ডল সম্পাদিত বাংলার দলিত আন্দলোনের ইতিবৃত্ত গ্রন্থটি দলিত সাহিত্যচর্চার ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

প্রথমদিকে বাংলা দলিত সাহিত্য মূলত কাব্যকেন্দ্রিক (মহানন্দ হালদার, বিচুরণ, পাগল, তারক সরকার) হলেও পরবর্তকালে অনিল ঘোড়াই-এর মুকুলের গন্ধ কিংবা মহীতোষ বিশ্বাসের মাটি এক মায়া জানে কিংবা কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরের উজানতলীর উপকথা, সমরেন্দ্র বৈদ্যর 'পিতৃগণ' উপন্যাস পাঠক মহলে সাড়া ফেলেছে। যতীনবালা, সুনীল কুমার দাস, গৌতম আলি, বিমলেন্দু হালদার, গোবিন্দ দাস শৌন্ড্র, উত্থানপদ বিজলী, গৌতম কুমার বৈদ্যর ছোটগল্প এই শাখার উজ্জ্বল সম্পদ। মালায়ালম লেখক তাকাষি শিবশঙ্কর এর লেখা চিংড়ি, মারাঠী লেখক নামদেব কাম্বড়ের লেখা রাঘবের দিনরাত সাহিত্য অ্যাকাদেমি পুরস্কারের পাশাপাশি পাঠক মহলে বিপুল সমাদর লাভ করেছে। দলিত আত্মজীবনীর পাশেই আমরা পেয়েছি কবি রসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের লেখা শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত, মহানন্দ হালদারের লেখা গুরুচান চরিত, মহীতোষ বিশ্বাসের লেখা বিন খংগড়ৈ সংগ্রাম, বিচরণ পাগলের লেখা শ্রী শ্রী হরিগুরুচাঁদ চরিত্রশুধা, দেবেশ রায়ের লেখা বরিশালের যোগেন মন্ডল-এর মতন আকর কিছু জীবনী গ্রন্থ।

দলিত সাহিত্য চর্চার আঙিনায় দলিত মহিলারা জন্ম দিয়েছেন এক স্বতন্ত্র স্বরের। আত্মকথনের ধারায় আমরা পেয়েছি মহারাষ্ট্রের নারী দলিত লেখিকা বেবি কাম্বলের দি প্রিজনস উই ব্রোক, মারাঠী লেখিকা শান্তাবাই কাম্বলের মাজ্যা জলমচি চিত্তর কথা, কুমুদ পাওড়ের অন্তঃস্ফোট, তামিল লেখিকা বামা কারুক্কু (১৯৯২), কেরালার এক আরণ্যক আদিবাসী গোষ্ঠীর নেত্রী সি. কে. জানুর আত্মজীবনী মাদার ফরেস্ট-এর অনুবাদ করেছেন জয়া মিত্র বসত নামে। মাহার গোষ্ঠীর লেখিকা উর্মিলা পাওয়ারের আত্মজীবনী আদ্যদান যা দি ওয়েড অফ মাই লাইফ : এ দলিত উইমেন্স মেমোয়ার নামে অনুবাদ করেছেন মায়া পণ্ডিত। এছাড়া আমরা পাই লেখিকা শান্তাবাই কালের আত্মকথন এগেইনস্ট অল অড্স (২০০০), যিনি কোলহাটি সম্প্রদায়ের একজন নর্তকী ছিলেন। ভিরাম্মার লেখা ভিরাম্মা: লাইফ অফ অ্যান আনটাচেবল্, শিল্পা রাজের লেখা দি এলিফেন্ট চেজারস ডটার, দলিত মেয়েদের আত্মজীবনীর ধারাকে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে বলিষ্ঠ স্থান দিয়েছে। বাঙালি দলিত লেখিকাদের আত্মকথন মধ্যে আমরা পেয়েছি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের আমি কেন চাঁড়াল লিখি, কাজের মেয়ে বেবী হালদারের আত্মজীবনী আলো আঁধারি, ঘরে ফেরার

পথ, বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে সমাদৃত। প্রান্তিক মানুষদের মাঝখান থেকে উঠে এসে লিলি হালদার লিখেছেন তাঁর বর্ণময় জীবনের আখ্যান ভাঙা বেড়ার পাঁচিল (২০১৯), কল্যানী ঠাকুর সম্পাদিত নীড় ও মনহোর মৌলি বিশ্বাস সমম্পাদিত পত্রিকা চতুর্থ দুনিয়া অক্লান্তভাবে প্রতিনিয়ত দলিত সাহিত্যিকদের প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছে। ত্রিপুরার ঊনত্রিশটি জনজাতি গোষ্ঠী ছাড়াও রয়েছে বহু বাঙালি দলিত শ্রেণি। তাদের দুঃখ দুর্দশার জীবন ও লড়াই করে বেঁচে থাকা নিয়ে শ্যামল বৈদ্য লিখেছেন দলিত গল্প দলিত লেখক শীর্ষক গ্রন্থটি, যাতে স্থান পেয়েছে একাধিক মর্মস্পর্শী ছোট গল্প। কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের ছোট গল্প সংকলন আন্ধার বিল ও কিছু মানুষ পাঠককে অল্প সময়ের জন্য হলেও বিহ্বল করে তোলে। সমসাময়িক দিনে জেসিকা দত্ত লিখেছেন কামিং আউট অ্যাজ দলিত : এ মেমোয়ার (২০১৯), যার উৎসর্গ অংশে পাই 'রোহিত ভেমুলা, হু লিট অ্যা ফ্লেম দ্যাট মেড মাই সাইলেন্স ইমপসিবল'। নিউইয়র্কের বাসিন্দা এই সাংবাদিক দীর্ঘদিন তাঁর দলিত আত্মপরিচয় গোপন রেখেছিলেন তাঁর পরিপার্শ্ব থেকে।

দলিত সাহিত্য সৃষ্টির এই ধারার ইতিহাসকে আরো গভীর অন্বেষণ করতে গিয়ে আমরা পেয়েছি শরণকুমার নিম্বলে দলিত নন্দনতত্ত্ব, মনোহর মৌলি বিশ্বাসের দলিত সাহিত্যের রূপরেখা ও দলিত সাহিত্যের দিগবলয়, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাদিত জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর-এর মতুয়া আন্দোলন ও বাংলার অনুন্নত সমাজ, যতীন বালার দলিত সাহিত্য আন্দোলন, সন্তোষা রাণা ও কুমার রাণা লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী শীর্ষক গ্রন্থ। বইগুলো অকুণ্ঠ ভাষায় বেশ কিছু জরুরি কিছু প্রশ্ন তুলেছে, যা তাত্ত্বিক, আলোচক, পাঠক, লেখককে বেশ গভীরে নাড়া দিয়েছে। দেশে বিদেশে বর্তমানে এই দলিত সাহিত্য চর্চা এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বীজমন্ত্রের উত্থান সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে। সেখান থেকে জন্ম নেওয়া প্রতিটি অক্ষরের কোণায় কোণায় রয়ে গেছে রক্তক্ষরণের আর্তনাদ। আলোচ্য প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সামগ্রিকভাবে দলিত সাহিত্য চর্চার বিপুল বিস্তৃতি সৃষ্টি ও উপলব্ধির ভুবনের খুব অল্প অংশই ছুঁতে পেরেছে, আশা রাখি আগামীর বিপ্লব এই সাহিত্য বর্গকে আরো প্রতিস্পর্ধা দেবে, মান্য সাহিত্য-এর প্রাঙ্গণে চিৎকার করে সাড়া ফেলে দিক এইসব অনতিক্রম্য অস্বস্তিভরা অক্ষরমালার দল।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশচন্দ্র (সম্পাদিত), মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিসার্স, সপ্তম মুদ্রণ, মে ২০১৫।

২. বসু রাজশেখর (অনূদিত), কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাসের মহাভারত, নবপত্র প্রকাশনা।

৩. বসু রাজশেখর (অনূদিত) বাল্মিকীর রামায়ণ, নবপত্র প্রকাশনা।